‘ফ্রিডম অন দ্য নেট ২০১৬’ প্রতিবেদন মতে বাংলাদেশে ইন্টারনেট স্বাধীনতা আংশিক

গোলাপ মুনীর

** ইন্টারনেট ব্যবহারে বিশ্বে সবচেয়ে স্বাধীন দেশ এস্তোনিয়া ও আইসল্যান্ড * গত বছরের প্রতিবেদনেও দেশ দুটি শীর্ষস্থানে ছিল*
** গত চার বছর ধরে বাংলাদেশে ইন্টারনেট স্বাধীনতা ক্রমাগত কমছে * গোটা বিশ্বে কমছে গত ৬ বছর ধরে*
** সবচেয়ে বেশি কমেছে উগান্ডা, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইকুয়েডর ও লিবিয়ায়*
** বাংলাদেশে ইন্টারনেট পেনিট্রেশন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম * বাংলাদেশে প্রেস ফ্রিডম উন্মুক্ত নয়*
** বাংলাদেশে সামাজিক মাধ্যম, আইসিটি অ্যাপ, রাজনৈতিক ও সামাজিক কনটেন্ট ব্লকের ঘটনা ঘটে।*

ইন্টারনেট ফ্রিডম। সোজা কথায় ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা। গত এক বছরে বাংলাদেশে ইন্টারনেট স্বাধীনতা সম্প্রসারিত না হয়ে বরং আরও সঙ্কুচিত হয়েছে। এই সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতায় বাংলাদেশের অবস্থানের অবনতি ঘটেছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশে অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের ওপর ধর্মীয় চরমপন্থীদের কয়েকটি হামলা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রবেশ সাময়িক বন্ধ করে দেয়া, ইন্টারনেটে মত প্রকাশের কারণে গ্রেফতার ও হামলার শিকার হওয়া ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে ইন্টারনেট স্বাধীনতা পরিস্থিতির এই অবনতি ঘটে। ইন্টারনেট স্বাধীনতায় গত চার বছর ধরেই বাংলাদেশ ক্রমাগত পিছিয়েছে। এ বছর সবচেয়ে বেশি পেছানো পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা ‘ফ্রিডম হাউস’ প্রণীত ‘ফ্রিডম অন দ্য নেট ২০১৬’ শীর্ষক এক বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে।

সাধারণ কিছু তথ্য

প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৬৫টি দেশের ইন্টারনেট স্বাধীনতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দেশগুলোকে নিজ নিজ সাফল্য অনুযায়ী শূন্য থেকে ১০০ নম্বর দেয়া হয়েছে। পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রতিটি দেশের অবস্থানকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শূন্য থেকে ৩০ পর্যন্ত নম্বর পাওয়া দেশগুলোকে ইন্টার ব্যবহারে ‘সম্পূর্ণ স্বাধীন’ বলে ধরা হয়েছে। ৩১ থেকে ৬০ নম্বর পাওয়া দেশগুলোকে বলা হয়েছে ‘আংশিক স্বাধীন’ এবং ৬১ থেকে ১০০ নম্বর পাওয়া দেশগুলোকে ইন্টারনেট ব্যবহারে ‘পরাধীন’ ধরা হয়েছে। লক্ষণীয়, এখানে যে দেশ যত বেশি নম্বর পেয়েছে, সে দেশে ইন্টারনেট স্বাধীনতা পরিস্থিতি তত বেশি খারাপ বলে জানতে হবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ পেয়েছে ৫৬ নম্বর। অতএব ধরে নেয়া যায় বাংলাদেশকে এই প্রতিবেদনে ইন্টারনেট ব্যবহারে ‘আংশিক স্বাধীন’ দেশের তালিকায় রাখা হয়েছে। ২০১৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইন্টারনেট ব্যবহারে সবচেয়ে স্বাধীন দেশ হলো এস্তোনিয়া ও আইসল্যান্ড। দেশ দুটি গতবারও শীর্ষস্থানে ছিল। শীর্ষ পাঁচে থাকা বাকি তিনটি দেশ হচ্ছে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি।

প্রসঙ্গত, নম্বর বণ্টনে তিনটি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে ইন্টারনেটে প্রবেশে বাধা ২৫ নম্বর, বিষয়বস্তু সীমিত করায় ৩৫ নম্বর ও ব্যবহারকারীর অধিকার লঙ্ঘনে ৪০ নম্বর। ইন্টারনেটে প্রবেশে বাধার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২৫-এ পেয়েছে ১৪ নম্বর। বিষয়বস্তু সীমিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ৩৫-এ পেয়েছে ১৪ নম্বর এবং ব্যবহারকারীর অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পেয়েছে ৪০-এ ২৮ নম্বর। এই সবগুলো মিলে ২০১৬ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়িয়েছে ৫৬। ২০১৫ সালে তা ছিল ৫১। আর ২০১৪ ও ২০১৩ সালে বাংলাদেশের এই স্কোর ছিল যথাক্রমে ৫১ ও ৪৯। এর সরল ▸

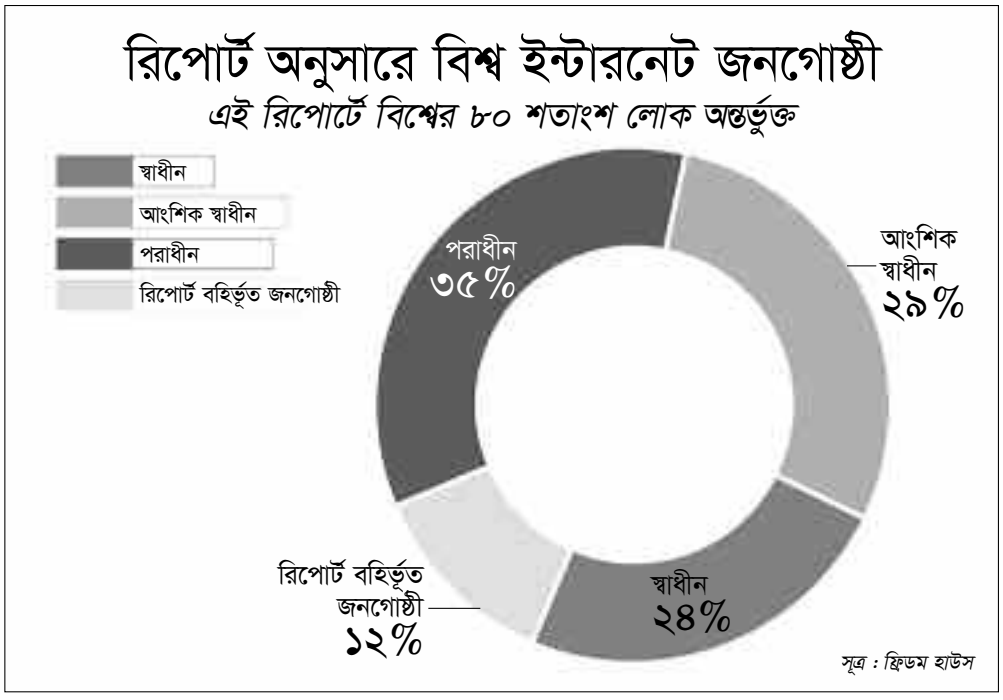

অর্থ বিগত চার বছর ধরে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারে মানুষের স্বাধীনতা ক্রমেই কমেছে। গত বছর বাংলাদেশসহ ৩৪টি দেশে ইন্টারনেট স্বাধীনতার অবনতি ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি কমেছে উগান্ডা, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইকুয়েডর ও লিবিয়ায়। প্রতিবেদনে বিশ্বের প্রায় ৮৮ শতাংশ ব্যবহারকারীর ইন্টারনেট ব্যবহারের অভিজ্ঞতা তুলে ধর হয়। সে অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশসহ ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ইন্টারনেট ব্যবহার পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটেছে।

বক্ষ্যমাণ এ প্রতিবেদনে আমরা নিচের উপশিরোনামগুলোতে 'ফ্রিডম অন দ্য নেট ২০১৬' শীর্ষক রিপোর্টের 'বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপোর্ট' অংশটির বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে বাংলাদেশে বিদ্যমান ইন্টারনেট স্বাধীনতা পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করব।

প্রসঙ্গ : আইসিটি আইন

এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১৫ সাল হচ্ছে এই প্রতিবেদনের কভারেজ পিরিয়ড। এই কভারেজ পিরিয়ডে নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায় নিলয় ও প্রকাশক ফয়সল আরেফিন দ্বীপনের ওপর ভয়াবহ হামলা চালানো হয়। এই বছরের প্রথম দিকে অভিজিত রায়, ওয়াশিকুর রহমান ও অনন্ত বিজয় দাস আলাদা আলাদা ঘটনায় নিহত হন। এরা সবাই অনলাইনে ভিন্নমত প্রকাশের কারণে নিহত হন। এই হামলা ২০১৬ সালে এসেও অব্যাহত থাকে। এপ্রিলে খুন হন জুলহাজ মান্নান। তিনি ছিলেন 'রূপবান' ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা। এই সাময়িকীটির লেখালেখি চলত সমকামী সমাজের মতামত সমর্থন করে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সরকারিভাবে ওপেন ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ও কমিউনিকেশনকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে উৎসাহিত করে। বেসরকারি বাণিজ্যিক অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারেরাও ইন্টারনেট ব্যবহারের বিস্তারে সহায়তা করছে। বাংলাদেশের প্রচলিত গণমাধ্যম কখনও কখনও পার্টিশান হলেও এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যদিও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে হয় নানা আইনি বাধা-বিপত্তির। অনলাইন নিউজ আউটলেটগুলোকে ২০১৫ সালে সরকারি নিবন্ধন নিতে বাধ্য করা হয়।

২০০৬ সালের ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) অ্যাক্ট প্রয়োগ করে ব্লগার ও অনলাইন কর্মকাণ্ডের ওপর অধিকতর কড়া নজরদারি কার্যকর করা হয়। এই আইনটি প্রথম প্রয়োগ করা হয় ২০১৩ সালে ৪ জন ব্লগারকে গ্রেফতার করার মাধ্যমে। এরা সবাই বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় চরমপন্থার ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন। ২০১৩ সালের আগস্টে এই আইনের একটি সংশোধনী পাস করা হয়। এর মাধ্যমে সর্বনিম্ন শাস্তি বাড়িয়ে ৭ বছর কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বছর কারাদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। সংশোধিত এ আইনের অধীনে পুলিশ গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই যেকাউকে গ্রেফতার করতে পারবে। এর ফলে এই আইনের অধীনে সরকারি মামলার সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৫ সালে সাংবাদিক প্রবীর শিকদারকে আইসিটি আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি অনলাইনে একজন মন্ত্রীর মানহানি ঘটিয়েছেন। পরে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। ফেসবুকে সরকারের বিরুদ্ধে কৌতুকের মাধ্যমে সমালোচনা করা এবং 'হার্মফুল লিঙ্ক' দেয়ার জন্য কমপক্ষে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। আলোচ্য প্রতিবেদন তৈরির সময় সরকার এই আইনের কয়েকটি অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করে দেখছে। ধর্মীয় চরমপন্থীদের হামলার ভয় ও সেই সাথে আইসিটি আইনে গ্রেফতার হওয়ার ভয় বাংলাদেশে একটি ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে ব্লগারদের ও ইন্টারনেট ইউজারদের মধ্যে চলছে এক ধরনের সেলফ সেন্সরশিপ।

ইন্টারনেটে প্রবেশে বাধা

সরকার বিগত এক দশকে ব্রডব্যান্ডের দাম বেশ কমিয়ে এনেছে। তা সত্ত্বেও ইউজারদের অভিযোগ– এখনও ইন্টারনেটের দাম অনেক বেশি।

প্রাপ্যতা ও সহজে প্রবেশযোগ্যতা : ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশের ১৪.৪ শতাংশ মানুষের কাছে ইন্টারনেট পৌঁছেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এই হার সবচেয়ে কম। কিন্তু সরকারের হিসাব মতে, এই হার ৩৯ শতাংশ। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পরিসংখ্যান মতে, মোবাইল ফোন পৌঁছেছে ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষের কাছে। আইসিটির ব্যবহার দ্রুত বাড়লেও বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে পিছিয়ে আছে। 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ২০১৫ গ্লোবাল আইটি রিপোর্ট' অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ১৪৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম। অবকাঠামো ও নিয়ন্ত্রণ পরিবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ভালো নয়, যদিও সার্বিক কমিউনিকেশন সার্ভিস মানুষের নাগালের মধ্যে। এর ফলে অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে।

'অ্যালায়েন্স ফর অ্যাফর্ডেবল ইন্টারনেট'-এর মতে, বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ তাদের আয়ের ওপর নির্ভর করে ৫০০ মেগাবাইট মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করতে সক্ষম। এই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এটি একটি সর্বোচ্চ হার। তা সত্ত্বেও ব্যবহারকারীদের অভিযোগ– গ্রাম এলাকার মানুষের জন্য বেসরকারি ইন্টারনেট সেবার দাম এখনও অনেক বেশি। লোকেলাইজড ইনফরমেশন ও বাংলা কনটেন্ট সৃষ্টির ফলে লোকাল ব্লগ হোস্টিং সার্ভিস জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কোনো পরিসংখান না থাকলেও শহর এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো বেড়ে উঠায় মনে হচ্ছে শহরগুলোতে ইন্টারনেট ইউজার আরও বাড়বে। সরকারের ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোতে, যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কৃষি খাতে ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়াস চলছে। ২০১৬ সালে সরকার ৪ হাজার ৫৪৭টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করেছে কমদামে গরিব মানুষকে ইন্টারনেট সেবা দেয়ার জন্য।

কানেকটিভিটির ওপর বিধিনিষেধ : বাংলাদেশ সরকার মাঝে-মধ্যেই নির্বাচনের সময় ও অন্যান্য অস্থিতিশীল পরিবেশের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। এই প্রতিবেদনের কভারেজ পিরিয়ডে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়ায় সরকারি নির্দেশের ব্যাপারটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি, যদিও ২০১৫ সালের শেষদিকে ইন্টারনেটে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তখন সরকার ফেসবুক ও অন্যান্য জনপ্রিয় সামাজিক গণমাধ্যম ব্লক করে দেয়। ধরে নেয়া হয়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কথা ভেবেই তা করা হয়েছিল। একই সাথে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ইন্টারনেট সার্ভিস বন্ধ রাখার আদেশ দেয়া হয়েছিল। কারণ, একটি খবর নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কারণে যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে বিমান পরিবহন শিল্পে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

বাংলাদেশের ভৌত ইন্টারনেট অবকাঠামো খুবই ভঙ্গুর, যা সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে যাওয়া SEA-ME-WE-4 ক্যাবল লাইননির্ভর। এই ফাইবার অপটিক লাইন সংযুক্ত করেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম ইউরোপকে সেই ২০১২ সাল থেকে। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়াল ক্যাবলের মাধ্যমেও সংযুক্ত, যার ব্যবস্থাপনায় রয়েছে কয়েকটি বেসরকারি কোম্পানি। এর ফলে ইন্টারনেট পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি কমেছে।

আইসিটি বাজার : বাংলাদেশে ইন্টারনেট ববহারকারীর সংখ্যা স্থিতিশীলভাবেই বাড়ছে। ৯০ শতাংশেরও বেশি ইন্টারনেট ইউজার ইন্টারনেটে প্রবেশ করে তাদের মোবাইল ফোন প্রোভাইডারদের মাধ্যমে। এরা সম্প্রতি দ্রুতগতির থ্রিজি সেবা দিতে শুরু করেছে। বাকিরা ফিক্সড লাইনের গ্রাহক– হয় ফিক্সড টেলিফোন লাইনের প্রচলিত আইএসপি তথা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে (৩ শতাংশের মতে) অথবা তিনটি ওয়্যারলেস ওয়াইম্যাক্স অপারেটরের (১ শতাংশ) মাধ্যমে। ২০১৫ সালে ১১৯টি আইএসপি সারাদেশে চালু ছিল, তবে সুস্পষ্টভাবে কোনো মার্কেট লিডার চিহ্নিত করা যায়নি। মোবাইল কানেকশন প্রোভাইড করে ৬টি অপারেটর। এ ক্ষেত্রে টেলিনরের মালিকানাধীন গ্রামীণফোনের বাজার অবদান সবচেয়ে বেশি, ৪৩ শতাংশ। এর পরে রয়েছে বাংলালিংক, যার বাজার অবদান ২৪ শতাংশ। রবির বাজার অবদান ২১ শতাংশ। বাকি তিন অপারেটর এয়ারটেল,

সিটিসেল ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিটকের সম্মিলিত অবদান ১১ শতাংশ। এ হিসাব ২০১৬ সালের জুনের।

নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান : ২০০১ সালের বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইনের আওতায় গঠিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সরকারি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টেলিযোগাযোগ ও আইসিটিসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দেখাশোনা করে। বর্তমান প্রশাসন ২০১০ সালে এই আইন সংশোধন করে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের ভার ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কাছে দেয়া হয় এবং বিটিআরসি হয় একটি সহায়ক সংস্থা হিসেবে। এর ফলে নতুন শুল্ক ঘোষণা ও লাইসেন্স নবায়নের মতো বেশ কিছু প্রক্রিয়ায় অহেতুক বিলম্বের কারণ ঘটে। ২০১৪ সালে আইসিটি মন্ত্রণালয়কে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে একীভূত করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল চলমান প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট শিল্পকে স্ট্রিমলাইনে আনা। অধিকন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের রয়েছে ইউএনডিপি সমর্থিত একটি অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, যার উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে শীর্ষ পর্যায়ের আইসিটি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর।

কনটেন্ট সীমিত করা

বিটিআরসি ২০১৫ সালের নভেম্বরে তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ফেসবুক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অন্যান্য যোগোযোগমাধ্যম বন্ধ করে রাখে। বলা হয়, নিরাপত্তার কারণে তা করা হয়েছে। অনলাইন কনটেন্টের ওপর রাষ্ট্রীয়ভাবে ম্যানিপুলেশনের কোনো ঘটনার কথা জানা যায়নি। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোকে বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের নির্দেশ দেয়া হয়।

ব্লকিং ও ফিল্টারিং : বাংলাদেশে ধর্মসংশ্লিষ্ট বিষয় অথবা সরকারি নেতাবিরোধী বিষয় সেন্সর করা হয়। আলোচ্য রিপোর্টের কভারেজ পিরিয়ডে সবচেয়ে জনপ্রিয় নিউজসাইট প্রথম আলো, বিডিনিউজ২৪ ও বাংলানিউজ২৪সহ দেশী ওয়েবসাইটগুলো টার্গেট ব্লকিংয়ের আওতায় ছিল না। কিন্তু এরপর ২০১৬ সালের আগস্টে সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, বিটিআরসি প্রথমবারের মতো ৩৫টি নিউজ ওয়েবসাইট বন্ধের আদেশ দিয়েছে। কর্মকর্তারা এই ব্লক করে দেয়ার কোনো কারণ জানাননি। তবে এসব সাইটের বেশিরভাগই ছিল বিরোধী রাজনীতির সমর্থক। আন্তর্জাতিক সামাজিক গণমাধ্যম ও যোগাযোগ অ্যাপ নিয়মিতভাবে সরকারের সেন্সরশিপের শিকার হয়। ২০১৫ সালের ১৮ নভেম্বর বিটিআরসি সেবাদাতাদের ফেসবুক, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ ও ভাইবার ব্লক করে দেয়ার নির্দেশ দেয়। অনুমিত হয়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে তা করা হয়। এই ব্লক করে দেয়ার কাজটি করা হয় একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ মামলার আসামি সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলী আহসান মুজাহিদের ফাঁসির আদেশ বহাল রেখে সুপ্রিমকোর্টের আদেশ দানের এক ঘণ্টা পর। সরকার ২২ দিন পর এই ব্লক তুলে নেয়ার আদেশ দেয়। ১৩ ডিসেম্বর বিটিআরসি ই-মেইল করে আইএসপিগুলোকে জানিয়ে দেয় টুইটার, স্কাইপি ও ইমো ব্লক করে দিতে। এর একদিন পর এই আদেশ অস্পষ্ট কারণে বাতিল করা হয়। অন্য সব সার্ভিস খুলে দেয়া হয় মধ্য-ডিসেম্বরে। ২০১৫ সালের প্রথম দিকে বেশ কিছু সামাজিক নেটওয়ার্ক ও অ্যাপ বন্ধ করে দেয়া হয় চার দিনের জন্য। মোবাইল সেবাদাতাদের নির্দেশ দেয়া হয় ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ, লাইন, ট্যাঙ্গো ও মাইপিপল ব্লক করে দেয়ার জন্য। অনুমিত কারণ হচ্ছে, সন্ত্রাসীরা এগুলো ব্যবহার করতে পারে। তা ছাড়া এগুলো বিরোধী রাজনীতির সমর্থক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরাও সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারে। ২০১২ ও ২০১৩ সালেও বাংলাদেশের নেটিজেনেরা ইউটিউব ও ফেসবুক ব্লকের মুখোমুখি হয়।

বিটিআরসি প্রাথমিকভাবে দেশীয় সেবাদাতাদের ওপর অনানুষ্ঠানিক আদেশ জারি করে কনটেন্ট সেন্সর করে। এরা তাদের লাইসেন্স ও পরিচালনা চুক্তির আওতায় এই আদেশ মানতে বাধ্য। সেবাদাতারা সরকারি সেন্সরশিপকে অস্থায়ী প্রকৃতির বলে বর্ণনা করেছেন। ২০১৫ সালের ১৯ জানুয়ারি মোবাইল অপারেটরেরা জানায়, বিটিআরসি তাদের লিখিত নির্দেশ দেয়, সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক মাধ্যম ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে।

কনটেন্ট রিমুভাল : ফেসবুক বন্ধ থাকা ২২ দিন সময়ে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, সরকারি কর্মকর্তারা ফেসবুক কোম্পানির প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের অনুরোধ করেন বাংলাদেশে তাদের অফিস স্থাপনের জন্য। বৈঠক শেষে ফেসবুক প্রতিনিধিরা কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেননি। ২০১৫ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ফেসবুক জানায়, তারা ধর্মীয় অবমাননার কারণে সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষাপটে চার টুকরা কনটেন্ট আটকে দিয়েছে।

মিডিয়া, ডাইভার্সিটি ও কনটেন্ট ম্যানিপুলেশন : বাংলাদেশ উপভোগ করে স্পন্দনশীল অফলাইন ও অনলাইন মাধ্যম, যদিও সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সেলফ-সেন্সরশিপ কোনো কোনো কমিউনিটিতে বাড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরম ও কমিউনিকেশন অ্যাপ ব্লক করে দেয়ার ফলে অনলাইন কনটেন্টের বৈচিত্র্য বা ডাইভার্সিটি হুমকির মুখে। তবে অনেক লোক ব্লক এড়াতে ব্যবহার করেন ভিপিএন।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ অনলাইন নিউজ আউটলেটগুলো ও দৈনিক পত্রিকার অনলাইন সংস্করণগুলোকে ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে বাধ্যতামূলক নিবন্ধন করতে বলা হয়। দেশের মুদ্রণ গণমাধ্যম স্বাধীনতার আগে থেকেই এভাবে বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের আওতাধীন। সরকারি 'প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট' হ্যান্ড আউটের মাধ্যমে সরকার জানিয়েছে, মিডিয়া ব্যবহার করে সমাজকে অস্থিতিশীল যাতে করতে না পারে, সে জন্যই এই বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ব্যবস্থা। তা লঙ্ঘনের ফলে কাউকে শাস্তি দেয়া হয়েছে, এমন খবর পাওয়া যায়নি। অনলাইন মিডিয়া প্র্যাকটিশনার ও সোশ্যাল

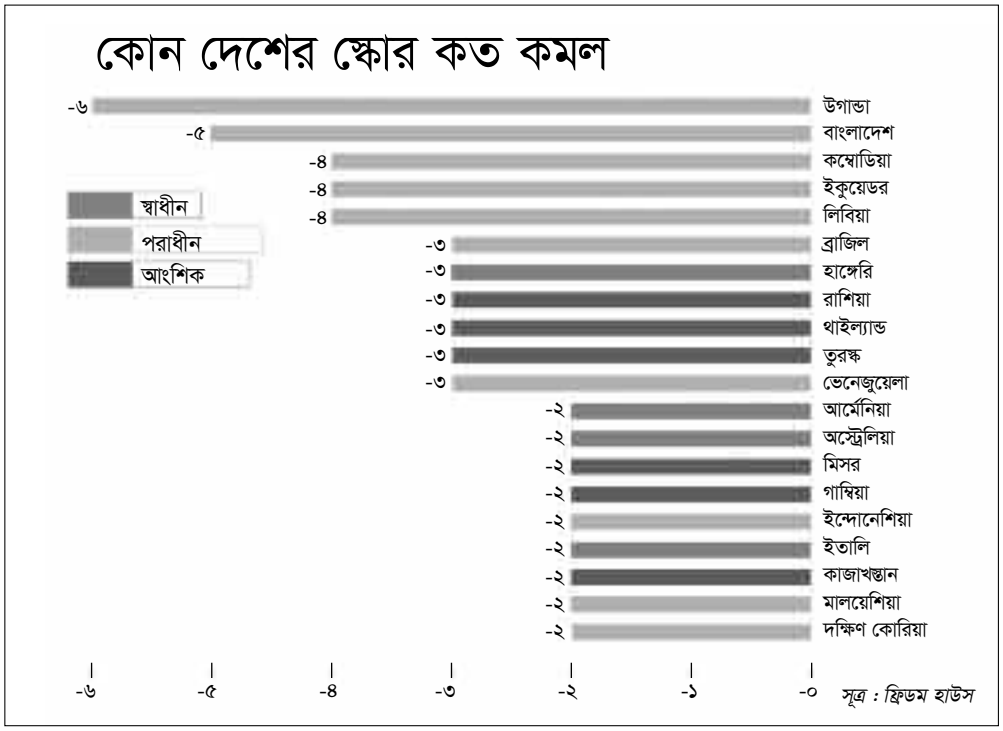

কমেন্টেটরেরা বলেছেন, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে এই প্রতিবেদনের কভারেজ পিরিয়ডে এক ধরনের সেলফ-সেন্সরশিপ কার্যকর ছিল। ওই সময়ে ব্লগারদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং ডিজিটাল কর্মকাণ্ডের জন্য অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগও তোলা হয়েছে। এ সময়ে কয়েক ডজন ব্লগার দেশ ছেড়ে চলেও গেছেন। কেউ কেউ তাদের ব্লগ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং কূটনৈতিক মিশনের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

ডিজিটাল সক্রিয়তাবাদ : গণজাগরণ মঞ্চ সূচনা করে শাহবাগ আন্দোলনের। এই মঞ্চ প্রাথমিকভাবে গড়ে ওঠে 'বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টস' নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। আজ পর্যন্ত এটি বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনলাইন অ্যাক্টিভিজমের উদাহরণ। এর প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু ২০১৩ সালের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের এই রায়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু দ্রুত গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনে যুক্ত হয় বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের আন্দোলনেও। প্রথমদিকে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়া হয় ব্লগিং, ফেসবুক ও মোবাইল টেলিফোনের মাধ্যমে। টুইটার যা বাংলাদেশে ততটা জনপ্রিয় ছিল না, তা শাহবাগ আন্দোলনের তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এই প্রতিবেদনের কভারেজ পিরিয়ডে জাতীয় পর্যায়ে প্রভাব ফেলার মতো কোনো অনলাইন অ্যাক্টিভিজম পরিলক্ষিত হয়নি, ডিজিটাল টুল হিসেবে ইন্টারনেটের ব্যবহার অব্যাহত থাকে। সামাজিক কাজের তহবিল সংগ্রহের জন্য সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারও চলতে থাকে। জনপ্রিয় প্ল্যাটফরম ও ম্যাসেজিং সার্ভিস ব্লকের ফলে এসব কাজ বিঘ্নিত হয়। অধিকন্তু, সরকার হোয়াটসঅ্যাপ ও ভাইবারের মতো টুল ইউজারদের সতর্ক করে দেয় সম্ভাব্য সেন্সরশিপ ও গ্রেফতারের। কর্মকর্তারা বলেন, সন্ত্রাস ও অপরাধকর্মে এসবের ব্যবহার সম্পর্কে সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখছে।

ইউজারের অধিকার লঙ্ঘন

বাংলাদেশে ২০১৫ সালে অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের জন্য ছিল সবচেয়ে বেশি অধিকার লঙ্ঘনের বছর। এই বছরটিতে ধর্মীয় চরমপন্থীদের হাতে প্রাণ হারান ব্লগার নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায় নিলয়, প্রকাশক ফয়সল আরেফিন দীপন ও সমকামী আক্টিভিস্ট জুলহাজ মান্নান। ২০১৫ সালের আগস্টে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় চার বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় তার অনুপস্থিতিতে বিচার করে। আইসিটি আইনে গ্রেফতারের শিকার হন সাংবাদিক প্রবীর শিকদার।

আইনি পরিবেশ : বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ (১ ও ২) অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। অনলাইন প্রকাশনা প্রচলিতভাবে এই বিধানের আওতাভুক্ত বলে বিবেচিত। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সরকারের নির্বাহী ও আইন বিভাগ থেকে স্বাধীন। কিন্তু সমালোচকেরা বলেন,

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার দলীয়করণ চলে। পুলিশ ও কতৃপক্ষ প্রায়ই সাধারণত সেন্সরশিপ বাস্তবায়ন ও নজরদারির ক্ষেত্রে কোর্টকে মেনে চলে না। ২০০৬ সালের আইনটি ইন্টারনেট ব্যবহারসংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়গুলো দেখাশোনা করে। যদিও আইনটিতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও এর বাস্তবায়নের সংজ্ঞা উল্লিখিত হয়েছে, এতে ইলেকট্রনিক উপায়ে নাগরিকদের অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘন করে। এই আইনের ৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে অনলাইনে কৃত একটি অপরাধের জন্য তিন বছরের কারাদণ্ড, অথবা ১ কোটি টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার কথা। তা সত্ত্বেও ৫৭ ধারা লঙ্ঘন করে বিতর্কিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রকাশ করলে কমপক্ষে সাত বছরের কারাদণ্ড ও ১ কোটি টাকা জরিমানা। ২০১৩ সালের ১৯ আগস্ট আইসিটি আইন সংশোধন করে সর্বোচ্চ কারাদণ্ড ১০ থেকে ১৪ বছরে বাড়ানো। ৬৮ ও ৮২ নম্বর ধারায় সাইবার অপরাধের বিচারের জন্য সাইবার ট্রাইব্যুনাল ও সাইবার আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। ২০১৬ সালে ঢাকায় নিম্নস্তরের বিচারকের আওতায় একটি সাইবার ট্রাইব্যুনাল কাজ করে। সাইবার ট্রাইব্যুনালের রায় বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে। সেই সাইবার আপিল ট্রাইব্যুনাল এখন পর্যন্ত গঠন করা হয়নি। কভারেজ পিরিয়ডে আরও আইনি বিধান প্রক্রিয়াধীন ছিল। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, তখন সরকার সক্রিয়ভাবে সাইবার অপরাধ দমনের জন্য 'ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট' তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল।

গোয়েন্দা নজরদারি ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা : বাংলাদেশের সংবিধান মতে বাংলাদেশের নাগরিকদের গোপনীয়তা ও যোগাযোগ রক্ষার অধিকার স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা ও ডাটা প্রটেকশন আইন নেই। এর ফলে ব্যবহারকারীরা যখন ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য বিনিময় করেন, তখন তাদের গোনীয়তা লঙ্ঘনের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও সরকার ব্যক্তি পর্যায়ে ব্লগ ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেনি, এই প্রতিবেদনের কভারেজ পিরিয়ডে সরকার অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোকে বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের বিধান চালু করে। ২০১৫ সালের পর থেকে নাগরিক সাধারণকে মোবাইল কানেকশনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের বাইরে বিস্তারিত বায়োমেট্রিক ও ব্যক্তিগত তথ্য সরবরাহ করতে বলে। নাগরিক অধিকার আন্দোলনকারীরা এ ব্যাপারে তাদের উদ্বেগের কথা জানান। কারণ, এই বায়োমেট্রিক ডাটা তৃতীয় কোনো পক্ষ ব্যবহার করতে পারে। 'বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি অ্যাক্ট ২০০১'-এর আওতায় সরকার প্রোভাইডারদের অনুরোধ করতে পারে এই ডাটা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরে রাখতে। এই আইনটি সংশোধন করা হয় ২০১০ সালে। এই সংশোধনী মতে, সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভয়েস বা ডাটা যোগাযোগের সময় আদালতের আদেশ ছাড়াই আড়ি পাততে পারবে। এ ব্যাপারে দেশী সেবাদাতাদের প্রতি সরকার সহযোগিতার অনুরোধ জানাতে পারবে। তবে তা লঙ্ঘনের ফলে কী ধরনের শাস্তি হতে পারে, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে আইনে কিছু বলা হয়নি।

কভারেজ পিরিয়ডের সময় খবর বেরোয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আড়াই কোটি ডলারের গোয়েন্দা নজরদারির যন্ত্রপাতি বিদেশী কোম্পানি থেকে কেনার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। উদ্দেশ্য গোয়েন্দা নজরদারির নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করে তোলা। প্রস্তাবে অর্থনীতিবিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটিকে বলা হয়, কেনাকাটার বিধিবিধান আরও শিথিল করতে, যাতে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) বৈধভাবে আড়ি পেতে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করতে পারে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন এই সেন্টার ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে কাজ করছে বলে খবরে প্রকাশ। উল্লিখিত প্রস্তাবে যেসব বিদেশী কোম্পানির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আছে– যুক্তরাষ্ট্রের ভেরিয়েন্ট সিস্টেমস ও এসএস৮, জার্মানির ট্রোভিকর ও ইউটিআইএমএসিও, ইতালির আরসিএস, চীনের ইনোভেটিও এবং সুইজারল্যান্ডের নিউ স্যাফট।

কারিগরি হামলা : কভারেজ পিরিয়ডে বাংলাদেশের অনলাইন সাইট ও ব্লগে কোনো সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেনি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে অনুপ্রবেশ করে কয়েকশ' কোটি ডলার সরিয়ে নেয়ার বহুল আলোচিত ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি বাংলাদেশে সাইবার সিকিউরিটির দুর্বলতার পরিচায়ক কজ